Volume 27 : 2024-2025
Journal of Philosophy and the Life-world
DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2025.27.00.18

আচার্য কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্যের বীক্ষণে কান্টের কৃতিপরীক্ষা এবং গীতার নিষ্কাম কর্ম

শ্রীঅনীশ দাশ

সহকারী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান
দর্শন বিভাগ, নেতাজী সুভাষ আশ্রম মহাবিদ্যালয়, সুইসা

সারসংক্ষেপ

তুলনামূলক দর্শনচর্চার জগতে ভারতীয় দর্শনে ভগবৎগীতার নিষ্কাম কর্মের সঙ্গে পাশ্চাত্য দার্শনিক কান্টের প্রস্তাবিত শর্তহীন অনুজ্ঞা নীতির তুলনাত্মক আলোচনা হয়ে থাকে। কান্টের সারগর্ভ দার্শনিক তত্ত্ব কিংবা ভগবৎগীতার নিষ্কাম কর্মকে নানাভাবে নানা দার্শনিক পর্যবেক্ষণ করেছেন। তাঁদের মধ্যে আচার্য কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্যের দৃষ্টিতে আলোচিত কান্টের কৃতিপরীক্ষাতত্ত্ব এবং অন্যদিকে, অদ্বৈতপ্রস্থানে পর্যালোচিত গীতার নিষ্কামতত্ত্ব – এই উভয়ের মধ্যে তুলনামূলক বিচারই বর্তমান প্রবন্ধের বিষয়। বর্তমান প্রবন্ধে কৃতির স্বরূপ, লক্ষণ, বিভাগ এবং আত্মসম্মান ও সদিচ্ছার ধারণার বিশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে কান্টের প্রস্তাবিত শর্তহীন অনুজ্ঞাকে বিচারের চেষ্টা করা হয়েছে। অন্যদিকে, কর্তাভিমানবিসর্জনপূর্বক ও ফলাকাঙ্ক্ষাত্যাগকরতঃ ঈশ্বরার্পণবুদ্ধিতে কৃত নিষ্কাম কর্ম কোন অর্থে কান্টের নীতিতত্ত্বের সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ এবং কোন অংশে বৈলক্ষণ্যযুক্ত তার সামূহিক আলোচনা গীতোপরি লিখিত আচার্য মধুসূদন সরস্বতীর *গূঢ়ার্থদীপিকা* অবলম্বনে করা হয়েছে। তার সঙ্গে কীভাবে নিষ্কাম কর্মের সঙ্গে স্বধর্ম ও বর্ণাশ্রমধর্ম সম্পর্কিত সেই প্রসঙ্গও আলোচিত হয়েছে। বর্তমান প্রসঙ্গে আমরা প্রদর্শন করেছি, গীতার নিষ্কাম কর্ম সম্পাদনে স্বয়ংপ্রবর্তকত্ব অপেক্ষিত নয়, বরং চিকীর্ষারূপ ধর্ম কিংবা বর্ণাশ্রমপ্রবর্তিত সামাজিক মানদণ্ড এবং পরিস্থিতি অর্থাৎ, স্থান-কাল-পাত্রভেদে উপলব্ধ ধর্মানুগ ব্যবহারিক প্রত্যুৎপন্নমতিই কর্মের প্রবর্তক হয়। কর্মফলে উদাসীন তথা নিরাসক্তচিত্ত হওয়াই হল নিষ্কাম কর্মের উদ্দেশ্য যা কান্টের বিশুদ্ধ প্রজ্ঞানির্ভর নৈতিক অনুজ্ঞার স্বরূপ ও প্রকৃতি থেকে যথেষ্ট বৈসাদৃশ্যযুক্ত। তবে উভয়মতের সাদৃশ্যের স্থল হলঃ উভয়ই ব্যক্তিগত লোভ, কামনা প্রভৃতি স্বার্থবুদ্ধি দ্বারা প্রেরিত হয়ে কোন কর্মে প্রবর্তিত হতে নিষেধ করেছে। এতদ্ব্যতীত, গীতার নিষ্কামতত্ত্বের ধারণায় কর্তাভিমানবিসর্জন, ফলাকাঙ্ক্ষাত্যাগ, অবিদ্যালেশ, কর্মক্ষয় এবং ঈশ্বরার্পণবুদ্ধির প্রসঙ্গ উপস্থিত হয়েছে যা কান্টের নীতিতত্ত্বের সঙ্গে সরাসরি সাযুজ্য রাখে না।

সূচকশব্দঃ কৃতি, স্বতন্ত্রকৃতি, পরতন্ত্রকৃতি, আত্মসম্মান, চিকীর্ষা, সদিচ্ছা, শর্তহীন অনুজ্ঞা, স্বধর্ম, বর্ণাশ্রমধর্ম, স্বভাবধর্ম, মানবধর্ম, নিষ্কাম কর্ম, সকাম কর্ম, ফলাকাঙ্ক্ষা, ঈশ্বরার্পণবুদ্ধি, অবিদ্যালেশ, কর্মক্ষয়

© 2025 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

Volume 27 : 2024-2025
Journal of Philosophy and the Life-world
DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2025.27.00.18

ভূমিকা

ইমানুয়েল কান্ট (1724-1804) এমন একজন দার্শনিক ছিলেন যিনি দর্শনের প্রতিটি মূল্যবান শাখায় তাঁর তাত্ত্বিক ভূমিকা রেখেছেন। বস্তুতঃ তিনি একজন দর্শনের গঠনতন্ত্রনির্মাতা (System Builder) ছিলেন ব'লে জ্ঞানতন্ত্র, অধিবিদ্যা, নীতিবিদ্যা প্রভৃতি দর্শনের প্রায় প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগে তাঁর বিশেষ অবদান পরিদৃষ্ট হয়। অন্যদিকে, ভারতীয় দর্শনে একইভাবে ভগবৎগীতা জ্ঞানতত্ত্ব, অধিবিদ্যা, ধর্ম, নীতিশাস্ত্র প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ দার্শনিক তত্ত্বে তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রেখেছে। নীতিবিদ্যার জগতে একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব হল গীতোক্ত নিষ্কাম কর্ম। স্বামী বিবেকানন্দের ভাষায়, গীতা সমগ্র জগতকে তথা হিন্দুদর্শনকে যে অভূতপূর্ব অভিনব দার্শনিক তত্ত্ব প্রখ্যাপন করেছে তাহল নিস্কাম কর্মতত্ত্ব। গীতায় প্রস্তাবিত নিষ্কাম তত্ত্বের সঙ্গে কান্টের সদিচ্ছাপ্রসূত নৈতিক তত্ত্বের তুলনামূলক সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। কারণ, উভয়েই ব্যক্তিগত স্বার্থবুদ্ধিনিরপেক্ষভাবে কর্মে প্রবৃত্ত হতে নির্দেশ দেয়। স্বার্থভাবনাপ্রসূত কর্মফলাসক্তিকে উভয় মতই কর্মের প্রবর্তকরূপে অঙ্গীকার করে না। এই কারণে তুলনামূলক দর্শনচর্চার জগতে ভগবৎগীতার নিষ্কাম কর্মতত্ত্বের সঙ্গে কান্টের প্রস্তাবিত শর্তহীন অনুজ্ঞা নীতির তুলনাত্মক আলোচনা হয়ে থাকে। বর্তমান প্রবন্ধেও আমরা উভয় মতের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য আলোচনা ক'রে তাদের উভয়েরই স্বরূপ বিশ্লেষণের চেষ্টা করব। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য, কান্টের সারগর্ভী দার্শনিক তত্ত্ব বিভিন্ন দার্শনিক বিভিন্ন প্রেক্ষিতে বিভিন্ন সময়ে বিচার করেছেন এবং এখনও করছেন। বস্তুতঃ এনাদের রচিত টীকা-ভাষ্য না পড়ে কান্টকে উপলব্ধি করাও বহু সময়ে কঠিন হয়ে পড়ে। এইসব দার্শনিকগণের মধ্যে সি ডি বোর্ড, কেম্প স্মিথ প্রমুখ উল্লেখ্য। এতদ্ব্যতীতও, কান্টদর্শনে উল্লেখযোগ্য বিশ্লেষণী টীকা রচনা করেছেন প্রখ্যাত ভারতীয় দার্শনিক আচার্য কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য (1875-1949)। এ কথা বলাই বাহুল্য, তাঁর প্রণীত ভাষ্যটি কেবল তাঁর বীক্ষণে কান্টের দর্শনবিচারেই সীমাবদ্ধ থাকে নি, বরং তা একটি স্বতন্ত্র দর্শন হয়ে উঠেছে। আচার্যের কান্টীয় বীক্ষণে বৈদান্তিক প্রভাবও স্পষ্ট। কান্টীয় দর্শনের উপর লিখিত তাঁর প্রখ্যাত গ্রন্থ হলঃ *কান্ট দর্শনের তাৎপর্য।* বর্তমান প্রবন্ধে কান্টের নীতিদর্শন আলোচনার ক্ষেত্রে তাঁর রচিত উক্ত গ্রন্থের থেকে "কৃতিপরীক্ষা" অধ্যায়টি পর্যালোচনা করা হয়েছে। কান্টের মতোই গীতাকেও বিভিন্ন দার্শনিক প্রেক্ষিতে বিভিন্নভাবে পর্যালোচনা করা হয়। বর্তমান নিবন্ধে গীতার উপর অদ্বৈতদর্শনের আলোকে মধুসূদন সরস্বতী বিরচিত *গূঢ়ার্থদীপিকা*কে অবলম্বন করা হয়েছে। গীতার তত্ত্ব আলোচনার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে অদ্বৈতমতকে প্রাধান্য দেবার কারণ হল আচার্য কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্যের কান্টীয় বীক্ষণে অদ্বৈতবেদান্তের সমূহ প্রভাব।

দার্শনিকের সমস্যাঃ নিষ্কাম কর্ম ও কান্টের শর্তহীন অনুজ্ঞা

যেকোনো প্রকার তাত্ত্বিক অন্বেষণ শুরু হয় প্রশ্ন উত্থাপনের মধ্যে দিয়ে। বর্তমান নিবন্ধের আলোচনাতেও কান্টের শর্তহীন অনুজ্ঞাতত্ত্বের সঙ্গে গীতোক্ত নিষ্কাম তত্ত্বের সম্বন্ধটি নানা প্রশ্নের জন্ম দেয়। প্রথমতঃ তুলনামূলক আলোচনার ক্ষেত্রে সর্বপ্রথমে এই প্রশ্নের উদয় হয় যে তুলনাত্মক বিষয়গুলির মধ্যে সমানতা এবং অসমানতার ক্ষেত্রগুলি কি যাদের ভিত্তিতে উভয়ের তুলনা করা যেতে পারে। বস্তুতঃ অত্যন্ত সদৃশ অথবা অত্যন্ত বিলক্ষণ – এরূপ কোন পদার্থের মধ্যে তুলনাত্মক কোন আলোচনা হতে পারে না। যে বিষয়গুলির মধ্যে কিছুক্ষেত্রে সাদৃশ্য রয়েছে এবং কিছু ক্ষেত্রে বৈসাদৃশ্যও রয়েছে সেই বিষয়গুলির ভিতরেই তুলনামূলক আলোচনা করা যেতে পারে। ফলতঃ নিষ্কাম কর্ম এবং কান্টের শর্তহীন অনুজ্ঞা নীতির মধ্যে তুলনা শুরু করার পূর্বে ইহা নিশ্চয় করা প্রয়োজন কোন কোন ক্ষেত্র বা বিষয়গুলিতে উভয়ের মধ্যে সমানতা এবং অসমানতা রয়েছে।

দ্বিতীয়তঃ নিষ্কাম কর্ম এবং শর্তহীন অনুজ্ঞা কাকে নৈতিক কর্মের প্রবর্তকরূপে অঙ্গীকার করে? – এই প্রশ্নটিও আমাদের বিবেচনার বিষয় হয়েছে। কারণ, নৈতিক কর্মের প্রবর্তক কারণ কি? – এরূপ প্রশ্নের

© 2025 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

Volume 27 : 2024-2025
Journal of Philosophy and the Life-world
DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2025.27.00.18

ভিত্তিতেই নৈতিক কর্মের স্বরূপ নিরূপিত হয়। যেমন, উপযোগবাদী (Utilitarian) তত্ত্বে কোন কর্ম তখনই নৈতিকরূপে বিবেচ্য হয় যখন সেই কর্মটি বহুজনের হিতসাধ্য এরূপ ইষ্টবুদ্ধিতে কৃত হয়। ফলতঃ এইস্থলে কর্মের প্রবর্তক হেতু হল বহুজনের হিতসাধ্যরূপে বিবেচ্য ইষ্টবুদ্ধি, বিশুদ্ধ বুদ্ধিপ্রসূত স্বয়ংপ্রবর্তকত্ব এইস্থলে কর্মে নেই। এই কারণে নৈতিক কর্মটিকে কান্টের শর্তহীন অনুজ্ঞাবিধিপ্রযুক্ত বলা যেতে পারে না। তাৎপর্য এই যে, আমাদের বিচারে, গীতোক্ত নিষ্কাম কর্ম সম্পাদনে স্বয়ংপ্রবর্তকত্ব অপেক্ষিত নয়, বরং চিকীর্ষারূপ ধর্ম কিংবা বর্ণাশ্রমপ্রবর্তিত সামাজিক মানদণ্ডের দ্বারা নিরূপিত স্বভাবধর্ম বা স্বধর্ম এবং পরিস্থিতি অর্থাৎ, স্থান-কাল-পাত্রভেদে উপলব্ধ ধর্মানুগ ব্যবহারিক প্রত্যুৎপন্নমতিই কর্মের প্রবর্তক হয়। কর্মফলে উদাসীন তথা নিরাসক্তচিত্ত হওয়াই হল নিষ্কাম কর্মের উদ্দেশ্য। অন্যদিকে, কান্টের ভাবনায় মানবীয় বিশুদ্ধ প্রজ্ঞা দ্বারা নিরূপিত স্বতন্ত্র কৃতিই স্বয়ংপ্রবর্তকরূপে নৈতিক কর্মের নিরূপক হেতু হয়ে থাকে। ফলতঃ শর্তহীন অনুজ্ঞা এবং নিষ্কাম কর্ম - উভয়ই যাদের নৈতিক কর্মের প্রবর্তক হেতুরূপে বিবেচনা করেছে, তাদের মধ্যে কোন সাদৃশ্য বা বৈসাদৃশ্য রয়েছে কিনা এই প্রশ্নের আলোচনা বর্তমান নিবন্ধে করা হয়েছে।

তৃতীয়তঃ নিষ্কাম কর্মের সঙ্গে ফলাকাঙ্খাবিসর্জন, ঈশ্বরার্পণবুদ্ধি, অবিদ্যালেশ, কর্মক্ষয়, কর্তাভিমানবিসর্জন প্রভৃতি ধারণার বিশেষ সম্বন্ধ রয়েছে। ফলতঃ বর্তমান প্রবন্ধে আমরা এই জিজ্ঞাসা করেছি, নিষ্কাম কর্মের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ধারণাগুলি কান্টীয় তত্ত্বসাপেক্ষে কতটা সাযুজ্যপূর্ণ হয়েছে অথবা হয়নি।

আচার্য কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্যের বীক্ষণে "*কৃতি*" : কান্টের কর্তব্যতাবাদী নীতিতত্ত্ব

আচার্য কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য কান্টের নীতিবিদ্যা সংক্রান্ত আলোচনাকে তাঁর *কান্ট দর্শনের তাৎপর্য* গ্রন্থে "কৃতিপরীক্ষা" নামক অধ্যায়ে বিবৃত করেছেন। প্রথমে অধ্যাপক ভট্টাচার্য "কৃতি" পদের অর্থ বিশ্লেষণ করেছেন। "কৃতি" বলতে তিনি *কর্তৃজ্ঞানাত্মক কর্মকে* বুঝিয়েছেন।[১] *কর্ম,* তাঁর মতে, *একপ্রকারের বিশেষ ক্রিয়াজন্য ফল যা ক্রিয়া-কল্পনার পরিণামরূপে প্রতীত হয়।*[২] বস্তুতঃ কর্ম হল কৃতির বিষয়। এর অর্থঃ কোনো প্রকারের নৈতিক কর্মকে আবশ্যিকভাবে ঐচ্ছিক ক্রিয়ার বিষয়রূপে পরিণত হতে হয়। সকল কর্মকে এই কারণে নৈতিক কর্মরূপে বিবেচনা করা যেতে পারে না। যেরূপ আমাদের স্বাভাবিক শ্বাস-প্রশ্বাসাদি কর্ম অনৈচ্ছিক কর্ম। এই প্রকারের কর্মের প্রতি আমাদের কোন প্রযত্ন থাকে না। কিন্তু যে কর্মগুলি নৈতিক কর্মরূপে বিবেচ্য হয় সেই কর্মগুলি সম্পাদন করার ক্ষেত্রে আমাদের সদিচ্ছাপূর্বক সংকল্প বা প্রযত্নেচ্ছা বিদ্যমান থাকে। আমাদের মতে, *ক্রিয়া-কল্পনা* বলতে আচার্য কৃষ্ণচন্দ্র *কর্মের প্রতি সদিচ্ছাপ্রসূত সংকল্পরূপ প্রযত্নচ্ছাকেই* বুঝিয়েছেন। এইস্থলে আরও একটি বিষয় প্রতীয়মান হয় যে, কোন ঐচ্ছিক ক্রিয়া সম্বন্ধে কেবল কল্পনা করলেই তা কর্মরূপে বিবেচ্য হবে না। ক্রিয়া-কল্পনাটিকে বাস্তব কর্ম হতে হবে। উদাহরণস্বরূপ কোন ব্যক্তি যদি মনে কেবল সৎকর্ম করার কথা ভাবতেই থাকেন, অথচ জীবনে সৎকর্ম অনুষ্ঠান না করেন, তবে তার সেই কর্মের কোন নৈতিক প্রাসঙ্গিকতা থাকে না। যাইহোক, কৃতির তাৎপর্য বিশ্লেষণে অধ্যাপক ভট্টাচার্য আরও বলেছেন, সকল কর্মে কর্তৃজ্ঞান হয় না। যে সকল কর্মে ক্রিয়া-কল্পনার কারক হেতুরূপে কর্তাসত্তাকারে (Agent) আমাদের অহংপ্রতীতি হয় অর্থাৎ, কর্তৃত্বের বোধ জন্মায় তাকেই তিনি কৃতি ব'লে অভিহিত করেছেন।[৩] যেমন কোন অবোধ শিশু যদি খেলার ছলে কাউকে ঢিল ছুঁড়ে আঘাত করে, তবে সেই কর্মকেও নৈতিকতার মূল্যে বিচার করা যায় না। যদিও এই কর্মটি শিশুটির স্বাভাবিক শ্বাস–প্রশ্বাস ক্রিয়ার ন্যায় নয়, তবুও এই কর্মটিকে অনৈচ্ছিকই বলতে হবে কারণ, কর্মটির প্রতি শিশুটির কোন কর্তৃত্ববোধ উপপন্ন হয়নি। কিন্তু যে প্রকারের কর্ম নৈতিক কর্মরূপে বিবেচ্য হয়, সেই প্রকারের কর্মকে অবশ্যই ঐচ্ছিক হতে হয় অর্থাৎ, তাকে কেবল সদিচ্ছাপ্রসূত সংকল্প বা প্রযত্নসাধ্যই নয়, কর্তৃজ্ঞানাত্মকও হতে হয়। বস্তুতঃ যা প্রযত্নের বিষয় হয় তা আবশ্যিকভাবে কর্তৃজ্ঞানেরও বিষয় হয়। কোন বিষয় প্রযত্নসাধ্য হল অথচ তা কর্তৃজ্ঞানেরও বিষয় হল না

© 2025 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

Volume 27 : 2024-2025
Journal of Philosophy and the Life-world
DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2025.27.00.18

– এমন হতে পারে না। কারণ, যা প্রযত্ন বা কৃতিজন্য হয় তা ইচ্ছাজন্য হয় এবং যা ইচ্ছাজন্য হয় তা আবশ্যিকভাবে জ্ঞানজন্য হয়।

এই প্রসঙ্গে আচার্য কৃষ্ণচন্দ্র বলেছেন, কৃতিতে কেবল কর্তৃজ্ঞানই থাকে না, কেন কর্মটি সম্পাদনে প্রবৃত্ত হচ্ছি সেই নিমিত্তকের জ্ঞানও সংশ্লিষ্ট থাকে। যেমন – আমি যখন কোন ঐচ্ছিক কর্ম সম্পাদন করি তখন আমার যেমন এই কর্তাবুদ্ধি থাকে যে আমিই এই কাজটি সম্পাদন করছি, তেমনই আমার এই বোধও থাকে যে কেন আমি এই নির্দিষ্ট কর্মটি সম্পাদন করছি।[৪] এর তাৎপর্য এই যে, কোন কর্ম নৈতিক কিনা তার বিচার সেই কর্মটির প্রবর্তকের ধারণা থেকে লাভ করা যায়। অধ্যাপক ভট্টাচার্য প্রবর্তকের ধারণার ভিত্তিতে কর্তৃজ্ঞানকে দুই প্রকারে বিভক্ত করেছেন। প্রথমতঃ কৃত কর্মের অতিরিক্ত ইষ্টফল লাভ করার প্রয়োজনে যদি ঐ কর্মটি সম্পাদন করা হয় তবে সেই কর্মসাধক ইষ্টবুদ্ধিকে পরতন্ত্রকৃতি এবং দ্বিতীয়তঃ কৃত কর্মের অতিরিক্ত কাম্য ইষ্টফল না লাভ করার প্রয়োজনে যদি ঐ কর্মটি সম্পাদন করা হয় তবে সেই কর্মসাধক ইষ্টবুদ্ধিকে স্বতন্ত্রকৃতি বলা হয়।[৫] এস্থলে ইষ্ট বলতে সুখ বা কল্যাণলাভ অথবা দুঃখপরিহার উভয়কেই বুঝতে হবে। মানুষ কোন কর্ম করতে তখনই প্রবৃত্ত হয় যদি সেই কর্মটি তার ইষ্টসাধকরূপে বিবেচ্য হয় অর্থাৎ, সেই কর্মের দ্বারা সুখলাভ বা দুঃখনিবৃত্তি হয়। পরতন্ত্রকৃতিতে মানব বাহ্যফলের কামনায় স্বার্থবুদ্ধির দ্বারা প্রেরিত ও আসক্তচিত্ত হয়ে কোন কর্ম সম্পাদন করে। কোন ঐচ্ছিক কর্ম তার সুখবর্ধন করবে নাকি দুঃখপরিহার করবে – কর্মের ইত্যাকার উপযোগিতা বিবেচনা ক'রেই মানব কর্মে প্রবৃত্ত হয়। বস্তুতঃ স্বতন্ত্র কৃতিতে কর্ম স্বয়ং ইষ্টসাধক হয় না বরং স্বয়ংই ইষ্ট হয়। কর্ম যে প্রকার ইষ্টবুদ্ধি বা ইষ্টসাধকবুদ্ধির দ্বারা সম্পাদিত হয়, সেই প্রকারের ইষ্ট বা ইষ্টসাধক বুদ্ধিই ঐ কর্মের নিমিত্তক বা প্রবর্তক হয়ে থাকে।[৬]

অনন্তর কৃতির বিশ্লেষণে অধ্যাপক ভট্টাচার্য দুই প্রকারের প্রবর্তকের আকার নিরূপণ করেছেন। প্রথমতঃ কৃতির প্রবর্তক হেতুরূপে যদি ইষ্টসাধনবুদ্ধি অপেক্ষিত হয় তবে তাকে পরতন্ত্রকৃতি এবং দ্বিতীয়তঃ কৃতির প্রবর্তক হেতুরূপে যদি ইষ্টবুদ্ধি অপেক্ষিত হয় তব তাকে স্বতন্ত্রকৃতি বলা হয়। ফলতঃ কৃতি–প্রবর্তক–ইষ্টসাধনবুদ্ধি হল ফলতন্ত্রপ্রবর্তনা্র আকার এবং কৃতি-প্রবর্তক-ইষ্টবুদ্ধি হল স্বতন্ত্রপ্রবর্তনার আকার।

অধ্যাপক ভট্টাচার্য আরও দেখিয়েছেন, স্বতন্ত্রপ্রবর্তনার উপলব্ধি পরতন্ত্রপ্রবর্তনার উপলব্ধি সাপেক্ষ।[৭] এর অর্থঃ স্বতন্ত্রপ্রবর্তনা থেকে কেউ কোন কর্ম সম্পাদন করলে তার এই বোধ থাকে যে এই কর্মটি ফলতন্ত্রকামনা থেকে সম্পাদিত হয়নি। কিন্তু পরতন্ত্রপ্রবর্তনা দ্বারা প্রেরিত হয়ে কেউ কোন কর্ম সম্পাদন করলে সেই কর্ম যে পরতন্ত্র অর্থাৎ, ফল-কামনা যে কৃতির অতিরিক্ত পদার্থ – এরূপ বোধ কারোর নাও উপপন্ন হতে পারে। যে ব্যক্তি স্বতন্ত্রপ্রবর্তনা উপলব্ধি ক'রে নি, তার কখনো এই জ্ঞান হতে পারে না যে ফলাকাঙ্ক্ষা আর কৃতি এক বিষয় নয়। এর থেকে বোঝা যায়, যে ব্যক্তি কেবল ফলাকাঙ্ক্ষা দ্বারা চালিত হয়ে অর্থাৎ, পরতন্ত্রপ্রবর্তনা থেকে কর্ম করেন, তিনি ফলাকাঙ্খাকেই ইষ্ট ব'লে মনে করেন। তিনি এটা বুঝতে পারেন না কৃতি থেকে ফলকামনা ভিন্ন একটি বিষয়। পরতন্ত্রপ্রবর্তনা থেকে যে কর্ম করা হয় তা মূলত স্বয়ং ইষ্টস্বরূপ হয় না বরং তা ইষ্টসাধক কর্ম হয়। কিন্তু কেবল ফলকামনার দ্বারা প্রযুক্ত হয়ে যিনি কর্ম করেন, তাঁর এই বোধ থাকে না। বস্তুতঃ কৃতি যে স্বতন্ত্রপ্রবর্তকও হতে পারে অর্থাৎ, কৃতিবিষয়ক কোন ঐচ্ছিক কর্ম যে স্বয়ং ইষ্টপ্রদ হতে পারে - এই ধারণাই তার থাকে না। একটি উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি বোঝানো যেতে পারে। ধরা যাক, একটি দেশে একই ভাষায় দুইজন ব্যক্তি সাহিত্যচর্চা করেন। প্রথমজন সাহিত্যচর্চা করেন সেই দেশের রাজার থেকে উপঢৌকন পাবার লোভে বা রাজার স্তুতিতে। দ্বিতীয়জন সাহিত্যচর্চা করেন কেবল সাহিত্যের স্বতঃমূল্যের ভিত্তিতে, কোন রাজস্তুতি বা পুরষ্কার পাবার মোহে তিনি সাহিত্য রচনা করেন না। ফলে প্রথমজনের সাহিত্যচর্চাটি ফলতন্ত্রপ্রবর্তনা থেকে কৃত এবং দ্বিতীয়জনের সাহিত্যকর্মটি স্বতন্ত্রপ্রবর্তনা থেকে প্রযুক্ত। এখন দ্বিতীয় ব্যক্তি যিনি সাহিত্যকে ভালবেসে

© 2025 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

Volume 27 : 2024-2025
Journal of Philosophy and the Life-world
DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2025.27.00.18

সাহিত্যচর্চা করেন, তিনি বিলক্ষণ জানেন, তাঁর কৃতকর্মটির মূলে প্রবর্তকরূপে কোন লোভ–মোহ প্রভৃতি ব্যক্তিগত কামনা–বাসনা নেই। সাহিত্যের স্বতঃমূল্য বিবেচনা ক'রে অর্থাৎ, সাহিত্যকর্ম স্বয়ংই আনন্দপ্রদ বা ইষ্টপ্রদ হয়, তা কোন অন্য ইষ্টের সাধন বা উপায় হয় না - এই বিবেচনায় তিনি কর্মে প্রবৃত্ত হন। কিন্তু যিনি পুরষ্কারের লোভে সাহিত্যরচনা করেন, তিনি বুঝতেই পারেন না সাহিত্যকর্মের একটি স্বতঃমূল্য রয়েছে। এভাবে স্বতন্ত্রপ্রবর্তনা পরতন্ত্রপ্রবর্তনার সাপেক্ষ হয়ে থাকে।

সুতরাং, এটা বলা যেতে পারে, কৃতির প্রবর্তক হল দুটি যথা – ফলাকাঙ্ক্ষা এবং বিধিবুদ্ধি। পরতন্ত্রকৃতির ক্ষেত্রে প্রবর্তক হয় ফলাকাঙ্ক্ষা এবং স্বতন্ত্রকৃতির ক্ষেত্রে প্রবর্তক হয় বিধিবুদ্ধি। বস্তুতঃ স্বতন্ত্রকৃতির ধারণাতেই বিধির ধারণা সংশ্লিষ্ট থাকে। স্বতন্ত্রকৃতির বিষয় যে স্বয়ং ইষ্ট ইত্যাকার প্রতীতি বিধির জ্ঞান ব্যতীত হতেই পারে না। বিধি বলতে এখানে কান্টের প্রণীত বুদ্ধিপ্রসূত শর্তহীন অনুজ্ঞাকেই বুঝতে হবে। সুতরাং, যে ব্যক্তি কোন ঐচ্ছিক কর্ম তার স্বতঃমূল্যের ভিত্তিতে সম্পন্ন করেন, সেই কর্ম তার কি ফলকামনাসিদ্ধি করবে সেই বিবেচনায় কর্ম করেন না তিনি বস্তুতঃ বিশুদ্ধ প্রজ্ঞাপ্রসূত বিধিবুদ্ধির দ্বারা চালিত হয়েই সেই কর্ম সম্পাদন করেন। "অমুক কর্মকে আমি তার স্বতঃমূল্যের ভিত্তিতে অর্থাৎ, কর্মটি স্বয়ংই ইষ্ট – এই জেনে কর্তব্যবোধে সম্পন্ন করছি, কোন ফল-কামনা দ্বারা প্রযুক্ত হয়ে সেই কর্ম সম্পাদন করছি না" – এই প্রতীতি স্বতন্ত্রকৃতিকে ইষ্ট বা কল্যাণস্বরূপ ক'রে তোলে এবং কর্মটি যে বিধিপ্রযুক্ত তাকেই সূচিত করে। এখানে স্বতন্ত্রকৃতি আর পরতন্ত্রকৃতির অপর একটি পার্থক্যও সূচিত হয়েছে। ফলজ্ঞান আর ফলকামনা – উভয়ই পৃথক বিষয়। এই হেতু পরতন্ত্রকৃতির প্রবর্তক ফলকে নয়, ফলকামনাকে বলা হয়েছে। কিন্তু স্বতন্ত্রকৃতির প্রবর্তক বলা হয়েছে বিধিকে, যা বিধিজ্ঞানের থেকে স্বতন্ত্র কোন বস্তু নয়। তাৎপর্য এই যে, বিধি বলতে আমরা বুঝি বিশুদ্ধ প্রজ্ঞাপ্রসূত সার্বভৌম বিধানকে যা আমাদের কোন ঐচ্ছিক কর্মকে তার স্বতঃমূল্যের ভিত্তিতে কর্তব্যতাবুদ্ধিতে সম্পাদন করতে প্রেরিত করে। এখন বিধিজ্ঞান হল সেই উপলব্ধি যা কোন কর্মের স্বতঃমূল্য অনুভব করতে এবং তদুপলব্ধির দ্বারা কর্তব্যবোধে ঐ কর্মানুষ্ঠানে আমাদের প্রেরণ করে। ফলতঃ বিধি আর বিধিজ্ঞানের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকে না।[৮]

এইস্থলে কেউ প্রশ্ন করতে পারেন, বিধিজ্ঞান ও বিধি উভয়ে স্বতন্ত্র কারণ, বিধিজ্ঞানের বিষয় হল বিধি। বিষয় কখনো বিষয়ী হতে পারে না। ফলে উভয়ের মধ্যে পার্থক্যই রয়েছে। এই প্রসঙ্গে আমাদের বক্তব্য, বিধি বলতে যে কর্তব্যবোধে কর্তব্য সম্পাদনের অনুজ্ঞাকে বোঝায় তা বিধির বিষয়ে আত্মসচেতনতা বা উপলব্ধি না হলে হওয়া সম্ভব নয়। পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে, জ্ঞান থেকেই ইচ্ছা হয় আর ইচ্ছা থেকেই হয় কৃতি বা প্রযত্নের ইচ্ছা। সম্ভবতঃ এই প্রেক্ষিতেই অধ্যাপক ভট্টাচার্য বিধি আর বিধিজ্ঞানকে তাদাত্ম্যক বলেছেন।

"কর্তব্যবোধে কর্তব্য পালন করার বিধি" সম্পর্কে প্রমাত্মক নিশ্চয় এবং স্বতন্ত্রকৃতির নিশ্চয়, অধ্যাপক ভট্টাচার্যের বিশ্লেষণে, পরস্পরসাপেক্ষ। তিনি বলেছেন, কান্টের মতে এই উভয়প্রকার নিশ্চয়কেই জ্ঞান বলা হয়। বস্তুতঃ এই উভয় প্রকারের নিশ্চয় হল একই জ্ঞানের দুই প্রকার। তবে মনে রাখা প্রয়োজন, এই যে স্বতন্ত্রকৃতি এবং বিধির জ্ঞান, তা বস্তুতঃ কৃতিতন্ত্র আত্মজ্ঞান। কর্তাজ্ঞানে ঐচ্ছিক কর্মের উপলব্ধি হলে যে প্রকারের আত্ম-উপলব্ধি হয় সেই প্রকারের আত্মজ্ঞানকেই কৃতিতন্ত্র আত্মজ্ঞান বলে। ধরা যাক, আমি জানি যে আমার কোন এক বন্ধু মাদকাসক্ত। এখন আমি তার সহপাঠী বন্ধু হিসেবে উপলব্ধি করলাম, তাকে নেশাসক্তি থেকে বের করে আনা কেবল তার বন্ধু হিসেবে শুধু নয়, কল্যাণকামী মানব হিসেবেও আমার কর্তব্য। আমি তার থেকে কোন প্রত্যুপকার-কামনা কিংবা তার ধন্যবাদার্হ হওয়ার জন্য এই কর্মে উদ্যোগী হলাম না। উপরন্তু, আমি এটাও উপলব্ধি করলাম যে আমার কৃত ঐচ্ছিক কর্মটি কোনরূপ ইষ্টসাধনের নিমিত্তক নয়, বরং তা স্বয়ংই ইষ্ট। এর অর্থঃ আমার কৃত কর্মটি আমার ঐহিক বা

© 2025 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

Volume 27 : 2024-2025
Journal of Philosophy and the Life-world
DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2025.27.00.18

পারত্রিক কোন ইষ্টসাধন করবে না। তথাপি কেবল সদিচ্ছাবশতঃ কর্তব্যবোধেই আমি এই কর্মে নিযুক্ত হলাম। ফলতঃ এইস্থলে আমার প্রথমতঃ নিশ্চয় হলঃ "আমি কর্তব্যবোধে কর্তব্য পালন করছি" এবং দ্বিতীয়তঃ আমার নিশ্চয় হলঃ আমার কৃত কর্মটি স্বতন্ত্রকৃতি। সুতরাং, এইস্থলে যুগপৎ আমার স্বতন্ত্রকৃতি এবং বিধিজ্ঞান হচ্ছে। লক্ষণীয়, উভয়জ্ঞানে যে স্বাত্মপ্রতীতি হয় তাই হল কৃতিতন্ত্র আত্মজ্ঞান। কান্টের মতে, কৃতিনিরপেক্ষভাবে আত্মার জ্ঞান হতে পারে না। মনে রাখতে হবে, পরতন্ত্রকৃতিতেও কর্তাবুদ্ধিরূপে যে আত্মজ্ঞান হয় তাও কৃতিসাপেক্ষ আত্মজ্ঞান। পার্থক্য কেবল এইটুকুই যে, স্বতন্ত্রকৃতিতে বিশুদ্ধ আত্মার প্রতীতি হয় কিন্তু পরতন্ত্রকৃতিতে বিশুদ্ধ আত্মপ্রতীতি হয় না। পরতন্ত্র কৃতিতে প্রবর্তক হল বিষয়কামনা। এই কারণে পরতন্ত্রকৃতিতে যে আত্মজ্ঞান হয় তার সঙ্গে বিষয়কাম অভিন্ন ব'লে প্রতীয়মান হয়।[৯]

কেউ এইস্থলে প্রশ্ন করতে পারেন, কোন ব্যক্তি যখন ফলকামনায় কর্ম সম্পাদন করেন, তখন তার তো এই অনুভব হতে পারে যে আমি কর্মটি তার স্বতঃমূল্য বিবেচনা ক'রে সদিচ্ছাবশতঃ কর্তব্যবুদ্ধি দ্বারা প্রেরিত হয়ে করছি না। ফলে এইস্থলেও তো বলা যেতে পারে, বিশুদ্ধ আত্মার প্রতীতি হয়। এরকম না হলে কারোর এই বোধের উপপত্তি সম্ভব হতো না যে বর্তমান কর্মটি স্বতন্ত্রকৃতি নয় বা আমি কর্মটি বিধিবুদ্ধিতে করছি না। এই প্রশ্নের উত্তরে বক্তব্য এই যে, কোন কর্ম বিধিবুদ্ধিতে সম্পাদন না করার বোধে কর্তব্যতা বা বিধির বেদনা বা অনুভবনিশ্চয়ই হয় মাত্র, কিন্তু বিধির জ্ঞান স্বতন্ত্রকৃতিতে হয় না।[১০] বেদনা (Intuition) ও জ্ঞানের (Knowledge) মধ্যে প্রভেদ এই যে, বেদনায় কোন নিশ্চয়তা বা যথার্থতা থাকে না। জ্ঞানে প্রমাত্মক নিশ্চয়তা থাকে। কিন্তু বিধিবুদ্ধি দ্বারা চালিত হয়ে কর্তব্যবোধে কর্ম সম্পাদন না করলে যে দুঃখ বা হেয়বোধ হয়, তার অনুভবাত্মক নিশ্চয়তা কীরূপে নিরূপিত হয়? এই প্রশ্নের উত্তরে অধ্যাপক ভট্টাচার্য বলেছেন, বিধিবুদ্ধি দ্বারা চালিত না হয়ে কোন কর্ম করলে যে হেয়বুদ্ধি বা পাপবুদ্ধির অনুভব হয় তা বস্তুতঃ "বিধি লঙ্ঘিত হচ্ছে বা পালন করা হচ্ছে না" – ইত্যাকার ঔপচারিক প্রতীতিমাত্র যা জ্ঞানরূপে আভাসিত হয়। বাস্তবিক অর্থে এই প্রকার দুঃখের বেদনাকে কোন নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান বলা যেতে পারে না। যদি বাস্তবিকই বিধি লঙ্ঘিত হচ্ছে ব'লে তার নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান হত তবে সে স্বতন্ত্রকৃতিতেই কর্ম সম্পাদন করত। কদাপি সে ফলকামনা দ্বারা চালিত হয়ে কোন কর্ম করত না। এই হেতু স্বতন্ত্রকৃতিতে কর্ম সম্পাদিত হলে তা বিধিবুদ্ধিতেই সম্পাদিত হয় এবং বিধিবুদ্ধিতে সম্পাদিত কর্ম দ্বারাই কৃত্যাত্মক শুদ্ধাত্মার বোধ উপপন্ন হয়।

স্বতন্ত্রকৃতি ও বিধি বস্তুরূপে এক হলেও জ্ঞেয়তার দৃষ্টিতে তাদের মধ্যে ইতরভেদ বর্তমান। অধ্যাপক ভট্টাচার্য বলেছেন, কর্তব্যবোধে কর্তব্য সম্পন্ন করার যে বিধিজ্ঞান তার দ্বারা বিশুদ্ধ প্রজ্ঞার জ্ঞান হয়। বিশুদ্ধ প্রজ্ঞার ঘটক হেতুরূপে যে এক বিশুদ্ধ আত্মার অস্তিত্ব রয়েছে, তার আভাসজ্ঞানও এক্ষেত্রে আমাদের হয়ে থাকে। তবে কান্টের মতে এই অনুভূতিকে নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান বলা যেতে পারে না কারণ, শুদ্ধ আত্মা সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান হবার কোন সংবেদিতা নেই। এই কারণে শুদ্ধ আত্মা হল অজ্ঞেয় এবং অজ্ঞাত। অপরদিকে, যে কৃতিতে আমাদের কামবর্জন হয়, সেই সংকল্প বা সদিচ্ছাপ্রসূত বিশুদ্ধ প্রজ্ঞানির্ভর কামনাত্যাগরূপ ক্রিয়া দ্বারা নিরূপিত শুদ্ধাত্মাই স্বতন্ত্রকৃতিরূপে জ্ঞেয়। বস্তুতঃ শুদ্ধাত্মার বিধিস্বরূপতাজ্ঞানকে শুদ্ধপ্রজ্ঞা এবং তার স্বাতন্ত্র্যজ্ঞানকে মিশ্র বা কামাপেক্ষ প্রজ্ঞা বলে। আমরা পূর্বেই বলেছি, স্বাতন্ত্র্যপ্রবর্তনা হল পারতন্ত্র্য প্রবর্তনাসাপেক্ষ। ফলতঃ যখন আমাদের স্বাতন্ত্র্যজ্ঞান হয় তখন আমাদের এই ধারণা থাকে যে আমার ঐচ্ছিক কর্মটি কোন ফলকামনাপ্রসূত নয়। এভাবে স্বাতন্ত্র্যজ্ঞানে কামবোধের অপেক্ষা থাকে ব'লে স্বতন্ত্রকৃতির মধ্যে দিয়ে আমাদের যে প্রজ্ঞা হয় তাকে কামাপেক্ষ প্রজ্ঞা বলে।[১১] এইস্থলে ইহা বিশেষ প্রণিধানের বিষয়, স্বতন্ত্রকৃতি ও বিধি বস্তুরূপে এক হলেও জ্ঞেয়তার দৃষ্টিতে তাদের মধ্যে যে পার্থক্য রয়েছে তা বিশেষভাবে আচার্য ভট্টাচার্যেরই বিশ্লেষণ। কান্ট কণ্ঠতঃ তাঁর বিশুদ্ধ প্রজ্ঞার বিচারে এরূপ কোন বক্তব্য সরাসরি পরিবেশন করেন নি।

© 2025 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

Volume 27 : 2024-2025
Journal of Philosophy and the Life-world
DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2025.27.00.18

অধ্যাপক ভট্টাচার্য স্বতন্ত্রকৃতিকেই ধর্মের অনুভব বা বেদনরূপে আখ্যায়িত করেছেন। কান্টের মতে, কর্তব্য বোধে কর্ম করা অর্থাৎ, বিধিপালন করা বা স্বতন্ত্রকৃতিই হল ধর্ম। অধ্যাপক ভট্টাচার্যের মতে, ধর্মের অর্থাৎ, স্বতন্ত্র কৃতির দ্বারাই নিষ্কাম ফলকল্পনা হয়।[১২] ধর্মের ফলকে তিনি শ্রেয়ঃ বা কল্যাণ বা ইষ্ট নামে অভিহিত করেছেন। ধর্মে অর্থাৎ স্বতন্ত্র কৃতিতে কল্যাণফলেরও আকাঙ্খা থাকে না। কিন্তু যখন ধর্মের বোধ বা অনুভব হয় তখন ধর্মের সেই বোধ বা অনুভবে কল্যাণপ্রদ নিষ্কামকল্পনা থাকে। এর অর্থঃ স্বতন্ত্রকৃতি কোন ব্যক্তিগত ইষ্টসাধক ও সুখবর্ধক উপাত্তের দ্বারা চালিত না হলেও তার কৃতির বিষয়টি যে স্বয়ং কল্যাণপ্রদ হয় এই বিষয়ে তার অনুভব অবশ্যই থাকে। বস্তুতঃ এই অনুভবটিই হল তার স্বতন্ত্রকৃতিতে কৃত কর্মপ্রেরণার *প্রণোদন* (Motive)।

অধ্যাপক ভট্টাচার্যের মতে, স্বতন্ত্রকৃতিতে যে কর্ম করা হয় তার দ্বারা বিমল আনন্দ লাভ করা যায়। এই আনন্দ ব্যক্তিগত কামনাপ্রসূত সুখের ন্যায় ক্ষুদ্র নয়। তিনি সুখাত্মক আনন্দ ও চিত্তপ্রসাদরূপ আনন্দ – এই দুই প্রকারে আনন্দকে বিভক্ত করেছেন। পরতন্ত্রকৃতির দ্বারা লভ্য আনন্দ হল সুখ যার সঙ্গে বাহ্যকামনাদি সংশ্লিষ্ট থাকে। কিন্তু স্বতন্ত্রকৃতিতে কৃত কর্ম (যা অধ্যাপক ভট্টাচার্যের পরিভাষায় ধর্মানুভবের সঙ্গে তাদাত্ম্য হয়) চিত্তপ্রসাদরূপ বিমল আধ্যাত্মিক আনন্দ প্রদান করে। অধ্যাপক ভট্টাচার্যের পরিভাষায়, স্বতন্ত্রকৃতির প্রসাদ বা অপ্রাকৃত পরিণামরূপে যে শুদ্ধ প্রজ্ঞা হয় তথা শুদ্ধাত্মার জ্ঞান হয় তাকে *আত্মসম্মান* বলে। বস্তুতঃ *আত্মসম্মান* বলতে আমরা বুঝেছি, বিশুদ্ধ প্রজ্ঞাপ্রসূত সংকল্প বা সদিচ্ছাবশতঃ স্বতন্ত্রকৃতিতে কৃতকর্মের অনুষ্ঠানে যে তৃপ্তি পাওয়া যায় তাই হল আত্মসম্মান। এই আত্মসম্মানই ধর্মে অর্থাৎ কর্তব্যবোধে কোন নৈতিক কর্মের অনুষ্ঠানে প্রবর্তক হেতু হয়। আধ্যাত্মিক এই তৃপ্তি বা চিত্তপ্রসাদ না থাকলে কোন ব্যক্তি স্বতন্ত্রকৃতিতে প্রবৃত্তও হতে পারে না। উপরন্তু, আত্মসম্মানকে আমরা কান্টের আত্মার *স্বায়ত্তশাসনরূপেও* (Autonomy of Self) চিন্তা করেছি। কান্টের মতে, বিশুদ্ধ প্রজ্ঞার দ্বারা চালিত হয়ে যখন আমরা কোন কর্ম কেবল কর্তব্যবোধেই সম্পন্ন করার সদিচ্ছা পোষণ করি বা সৎসংকল্প গ্রহণ করি, তখন বস্তুতঃ আমাদের এই অনুভব হয় যে আমাদের কর্মসম্পাদনকারী বুদ্ধিমান সত্তা কর্তারূপে আমাদের যেমন একদিকে শাসন করছে, অন্যদিকে সে নিজেও কর্তব্যবোধে কোন কর্মসম্পাদনায় বাধ্য থাকছে। এই অনুভবকে অধ্যাপক ভট্টাচার্য *নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান* বলেন নি কিন্তু তাকে *বেদন* (Intuition) -রূপে চিহ্নিত করেছেন। আমাদের বিচারে, এই বেদনটি হল আত্মার স্বায়ত্তশাসন। অধ্যাপক ভট্টাচার্যের মতে, আত্মসম্মানে শাসিত আত্মা যে ভৃত্যভাব অনুভব করে তা আত্মার নিরভিমানত্ব প্রকাশ করে এবং শাসক আত্মা যে প্রভুভাব অনুভব করে তা চিত্তপ্রসাদের দ্যোতক হয়। [১৩] বলা বাহুল্য, উল্লিখিত আত্মসম্মানই কান্টের মতে নিষ্কাম কর্মে প্রবৃত্তির নিমিত্তক হয়। তবে মনে রাখতে হবে, *নিরভিমানত্ব* বলতে কিন্তু আত্মার কর্তৃজ্ঞানরাহিত্যকে বোঝায় না। কান্ট কখনো এমন বলেন নি যে সদিচ্ছাকৃত কর্ম দ্বারা কর্তাসত্তার কর্তৃত্ববোধ চলে যায়। বরং ঐচ্ছিক কর্মে কর্তৃত্ববোধ চলে গেলে সেই কর্মকে আর নৈতিক কোন কর্ম ব'লে বিবেচনা করা যেতে পারে না। ফলে, নিরভিমানত্ব বলতে বোঝায় - বুদ্ধির দ্বারা কোন কর্মকে কর্তব্যবোধে অনুষ্ঠান করার প্রত্যয় যখন কেউ সদিচ্ছারূপে গ্রহণ করে তখন সেই ব্যক্তি সেই প্রত্যয়পালনেও বাধ্যতা অনুভব করে। কারণ, এমনটি না করলে আত্মবিরোধ দৃষ্ট হয়। এই কারণে ন্যায়পরায়ণ সেই কর্তা বুদ্ধির দ্বারা নিরূপিত বিধি অনুসরণপূর্বক কর্মানুষ্ঠানকে কর্তব্য ব'লে বিবেচনা করলে তাকে কর্মে রূপায়িত ক'রে পালন করতেও বাধ্য থাকে। এই অর্থেই অধ্যাপক ভট্টাচার্য এইস্থলে আত্মার নিরভিমানত্বকে বুঝিয়েছেন ব'লে আমাদের মনে হয়েছে।

আমাদের পর্যবেক্ষণে এই স্থলে মনে হয়েছে, অধ্যাপক ভট্টাচার্যের কান্টীয় কৃতির বীক্ষণ বৈদান্তিক প্রভাবপুষ্ট। বৈদান্তিক মতানুযায়ী, আত্মা আনন্দময়। আত্মার সেই আনন্দের প্রভাব আমাদের জাগতিক (Phenomenological) ব্যবহারেও প্রতীত হয়। এই কারণে বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ মতে, আত্মার প্রতি

© 2025 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

Volume 27 : 2024-2025
Journal of Philosophy and the Life-world
DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2025.27.00.18

প্রীতিবশতঃই সকল কিছু আমাদের প্রিয় হয়।[১৪] লক্ষণীয় অধ্যাপক ভট্টাচার্য পাপ, পুণ্য প্রভৃতি যেসকল পরিভাষা কান্টের কৃতিপরীক্ষার বিশ্লেষণে ব্যবহার করেছেন, সেই সকল পারিভাষিক শব্দমালাও বৈদান্তিক প্রভাব দ্বারা সংশ্লিষ্ট। ফলতঃ আমরা দেখি, বৈদান্তিক আত্মার আনন্দস্বরূপতাই সুখরূপে এবং আধ্যাত্মিক চিত্তপ্রসাদরূপে কান্টের তত্ত্বে উদ্ভাসিত হয়েছে। তবে একথা ভুললে চলবে না যে বৈদান্তিক আত্মার তত্ত্বের সঙ্গে কান্টের প্রস্তাবিত আত্মতত্ত্বের বিস্তর প্রভেদ রয়েছে। বস্তুতঃ অধ্যাপক ভট্টাচার্য কান্ট দর্শনে প্রস্তাবিত আত্মতত্ত্বকেই অবধারণ করতে ছেয়েছিলেন। নৈতিক সংকল্পে আমাদের আত্মার যথার্থতা নিশ্চয় হয় আর অন্যদিকে জ্ঞানাত্মক অবস্থায় আমাদের বিষয়ের নিশ্চয় হয়। ভট্টাচার্যের মতে, কান্ট অদ্বৈতীর ন্যায় আত্মাকে নির্বিকার, নিষ্ক্রিয় বলেন নি। তিনি এও বলেন নি যে আধ্যাত্মিক চর্যার দ্বারা বিষয় ও বিষয়ী আত্মা উভয়ে অভেদাত্মকতা লাভ করে। কান্ট আত্মানুভূতিকেও খণ্ডন করেছেন। তাঁর মতে, আত্মা হল অজ্ঞেয় ও অজ্ঞাত। কিন্তু বেদান্ত আত্মানুভূতিকে খণ্ডন করেন নি। বৈদান্তিকের মতে, আধ্যাত্মিক উন্নতির দ্বারা জীব আত্মচৈতন্য লাভ ক'রে ব্যবহারিক সত্তার পরপারে যেতে পারে। কান্টের মতে আত্মা সচেতন ক্রিয়া। জ্ঞানাত্মক ও সংকল্পাত্মক ব্যাপারে তার স্বরূপ প্রতীত হয়। কান্ট আত্মাকে অতিবিষয়ক (Transcendental) বলেছেন কারণ তার বিষয়ে আমরা প্রতীত্যাত্মক বেদন বা অনুভব অর্জন করলেও তার বিষয়ে নিশ্চিত প্রমাত্মক প্রতীতি লাভ করতে পারি না। আত্মা বিষয়ে নিশ্চিত জ্ঞান লাভ না করার অন্য কারণ হল আত্মা বিষয়ে আমাদের কোন সংবেদিতা থাকে না। কান্ট অতিবিষয়ক তত্ত্ব বলতে সেই তত্ত্বকে বুঝিয়েছেন যা চেতনরূপ আত্মা থেকে ভিন্ন নয়। স্বচেতনায় স্ব-স্বরূপে যে আত্মা ক্রিয়মান হয় তাই হল বিশুদ্ধ আত্মা। কান্টের মতে স্বতন্ত্র চেতনাত্মক ক্রিয়ারূপেই আত্মা অতিবিষয়ক হয়। বস্তুতঃ যেরূপ দৌড়ানোর কৌশল দৌড়নো থেকে ভিন্ন হয় না সেই প্রকারেই সংকল্পাত্মক ক্রিয়া সংকল্প থেকেও ভিন্ন হতে পারে না। একই সংকল্পাত্মক চেতনাত্মা বিষয় ও বিষয়ী উভয়রূপেই প্রতীত হয়। সুতরাং, কান্টের ব্যাখ্যাকালে অধ্যাপক ভট্টাচার্য অদ্বৈত বেদান্তের প্রভাবে প্রভাবিত হলেও এই কথা স্বীকার করতে হবে যে কান্টের প্রস্তাবিত আত্মা ও বেদান্ত কল্পিত আত্মার মধ্যে যথেষ্ট প্রভাব বিদ্যমান।

বৈদান্তিক বীক্ষণে গীতোক্ত নিষ্কাম কর্ম

অধুনা আমরা পর্যালোচনা করব গীতায় যে নিষ্কাম কর্ম আলোচিত হয়েছে তার স্বরূপ কি। পূর্বেই উল্লেখ করেছি, এই প্রসঙ্গে আমরা বৈদান্তিক দৃষ্টি অবলম্বনে গীতোপরি লিখিত *গূঢ়ার্থদীপিকা* টীকা অবলম্বন করেছি। সংক্ষেপে নিষ্কাম কর্ম বলতে বোঝায় - *কর্তাভিমানবিসর্জনপূর্বক ও ফলাকাঙ্ক্ষাত্যাগকরতঃ ঈশ্বরার্পণবুদ্ধিতে কৃত কর্ম।*

অনেকে আশঙ্কা করতে পারেন, নিষ্কাম কর্ম বলতে হয়ত অকর্মকে অর্থাৎ, কর্মহীনতাকে বোঝায়। কিন্তু এর উত্তরে বক্তব্য হবে এই যে, গীতোক্ত নিষ্কাম কর্ম বলতে কখনোই কর্মহীনতাকে বোঝায় না। বস্তুতঃ গীতার তৃতীয় অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছেনঃ নিয়ত কর্ম অনুষ্ঠান করা কর্তব্য কারণ কর্ম অনুষ্ঠান না ক'রে কখনোই কেউ ক্ষণকালও স্থির থাকতে পারেন না। প্রাকৃতিকভাবে অবশ হয়েও মানুষকে কর্ম করতে হয়।[১৫] গীতোক্ত বাক্যটির ব্যাখ্যায় আচার্য মধুসূদন বলেছেন, যে ব্যক্তি ব্রহ্মজ্ঞান লাভ ক'রে আত্মশুদ্ধ হয়নি সেই বহির্মুখ অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি এক ক্ষণও কর্ম না করে থাকতে পারে না।[১৬] সুতরাং, ব্রহ্মজ্ঞানলাভের সহায়ক কর্মক্ষয়কারীরূপে অনুষ্ঠেয় নিষ্কাম কর্ম যে কোন কর্মহীন অবস্থা নয় তা সহজেই অনুমেয়। লক্ষণীয়, অদ্বৈত মতবাদে জ্ঞান বলতে আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মপ্রাপ্তিকে বোঝানো হয়েছে যা কর্মানুষ্ঠান দ্বারা কদাপি লভ্য নয়। বস্তুতঃ এই তত্ত্বখ্যাপনের জন্যই অদ্বৈতী বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীর ন্যায় জ্ঞান ও কর্মের সমুচ্চয়কে অঙ্গীকার করেন না। এই হেতু এখানে বলা হয়েছে যে সকল তপস্বী ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেন নি তাঁদের জন্য নিষ্কাম কর্ম অনুষ্ঠান করা বিধেয়। সুতরাং, এই বাক্য থেকে ইহা জানা যায়, বৈদান্তিক মতে কর্ম দ্বারা জ্ঞান লাভ করা যায় না ব'লে নিষ্কাম কর্ম দ্বারা সাক্ষাৎ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয় না। কিন্তু বারংবার

© 2025 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

Volume 27 : 2024-2025
Journal of Philosophy and the Life-world
DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2025.27.00.18

নিষ্কাম কর্মানুষ্ঠানের অভ্যাস দ্বারা চিত্তমালিন্য দূরীভূত হয়। চিত্তমালিন্য দূর হলেই বাস্তবিক ব্রহ্মসাক্ষাৎকার ঘটে। এভাবে নিষ্কাম কর্ম সরাসরি ব্রহ্মসাক্ষাতের হেতু না হলেও চিত্তমালিন্যের বিমোচন দ্বারা ব্রহ্মসমাধিলাভের সহায়ক হয়। উপরন্তু আমরা এও বুঝতে পারি, যিনি ব্রহ্মপ্রজ্ঞায় স্থিতপ্রজ্ঞ হয়েছেন, তাঁর ক্ষেত্রে নিষ্কাম বা সকাম কোন কর্মানুষ্ঠানই অপেক্ষিত নয়। বস্তুতঃ কর্মত্যাগ বলতে আসক্তিত্যাগ বোঝায়। কেবল হস্ত-পদাদির সঞ্চালন পরিত্যাগকে কর্মত্যাগ বলা যায় না। কর্মে নিরভিমান হওয়ায়ই জ্ঞানীর লক্ষণ। তবে এখানে কান্ট যেরূপ নিরভিমানত্বকে বুঝিয়েছেন তাকে বুঝলে হবে না। এইস্থলে নিরভিমানত্ব বলতে কর্মে আসক্তি তথা কর্তাবুদ্ধির পরিত্যাগকেই বুঝতে হবে। জ্ঞানীদের অবিদ্যাগ্রন্থি নির্মোচিত হয়ে গেছে ব'লে তারা প্রকৃতির স্বাভাবিক সত্ত্বাদি গুণ দ্বারা পরিচালিত হন না। এই কারণে তাঁরা কর্তাবুদ্ধিরহিত হয়ে যান। ফলে, তাঁদের আর কোন নতুন কর্ম সৃষ্টিরও প্রয়োজন পড়ে না। তবে যিনি অজ্ঞানী তাঁর জন্য নিষ্কাম কর্মানুষ্ঠানই কর্তব্য। তিনি প্রকৃতির স্বভাবসঞ্জাত গুণগুলির দ্বারা চালিত হন। ফলে, তিনি অস্বতন্ত্র হয়ে কর্ম সম্পাদন করতে কার্যতঃ বাধ্য থাকেন। এই প্রকার অশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তির কারণেই নিষ্কাম কর্ম বিহিত হয়েছে।[১৭] বারংবার অভ্যাসের দ্বারা নিষ্কাম কর্ম সম্পাদন করলে তাঁকেও শাস্ত্রে যোগী আখ্যায় আখ্যায়িত করা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে আচার্য মধুসূদন বলেছেন, সন্ন্যাস বলতে কর্মত্যাগকেই বোঝানো হয়। অন্যদিকে যোগ বলতে চিত্তবিক্ষেপের অভাবকেই বোঝায়। এখন এইরূপ কর্মত্যাগীকে যোগীই বলতে হবে কারণ, তিনি কর্মফলত্যাগ ক'রে কর্মফলতৃষ্ণারূপ চিত্তবিক্ষেপের অভাববিশিষ্ট হয়েছেন। ফলতঃ তাঁকে যোগীরূপে অভিহিত করা যুক্তিতঃ অসঙ্গত নয়।[১৮] তবে স্মর্তব্য, ব্রহ্মজ্ঞানী ব্রহ্মজ্ঞান লাভের পরও প্রারব্ধবশতঃ কর্ম করেন। বলা বাহুল্য, তাঁদের অনুষ্ঠেয় সেই কর্মও নিষ্কামই হয়। তাৎপর্য এই যে, ব্রহ্মসমাধিলাভের অনন্তরও তাঁদের দেহধারণ করার মতো পর্যাপ্ত অবিদ্যা লেশরূপে অবশিষ্ট থাকলে তাঁদের আমৃত্যু সেই অবিদ্যাবশেষ প্রারব্ধ কর্মরূপে ভোগ ক'রে যেতে হয়। এই অবস্থায় জীবন্মুক্ত যোগীদের কোন নতুন কর্ম সৃষ্টি হয় না অর্থাৎ, তাঁদের অবিদ্যাদৃষ্টি নির্মূল হয়ে যায় ব'লে অবিদ্যানিবন্ধন কর্মপাশ নতুনভাবে তাঁদের আর বন্ধন সৃষ্টি করতে পারে না। নতুন কোন কর্ম সৃষ্টি না হওয়ায় এবং সকল সঞ্চিত কর্ম বিনষ্ট হয়ে যাওয়ায় তাঁদের পরবর্তীতে আর কোন জন্ম হয় না।

নিষ্কাম কর্মে অপর একটি উল্লেখযোগ্য ধারণা হল ঈশ্বরের ধারণা। বস্তুতঃ কর্মফলত্যাগের ধারণা থেকেই ঈশ্বরের ধারণা নিষ্কাম কর্মের প্রত্যয়ে সংশ্লিষ্ট হয়েছে। ভবিষ্যৎ কর্মের ফলাকাঙ্খা শুধু বর্জন করলেই হবে না, পূর্বকৃত কর্মের ফলরাশিও মানবসত্তার থেকে ঊর্ধ্বতন সত্তাকে অর্পণ ক'রে "শান্তি" বা চিত্তপ্রসাদ অর্জন করতে হবে – এইরূপ ধারণা থেকেই ঈশ্বরে কর্মফলাকাঙ্খা ও কর্মফল সমর্পণের ধারণা সৃষ্টি হয়। ভক্তিযোগে তাই গীতা বলেছে – অভ্যাস থেকে জ্ঞান, জ্ঞান থেকে ধ্যান এবং ধ্যান থেকে কর্মফলত্যাগ শ্রেষ্ঠ। কর্মফলত্যাগের দ্বারা অচিরেই শান্তি লাভ করা যায়।[১৯] এই প্রসঙ্গে আচার্য মধুসূদন বলেছেন, কর্মফলসমর্পণের দ্বারা অজ্ঞ ব্যক্তির দ্রুত কর্মক্ষয় তথা অবিদ্যানাশ হয় ব'লে অব্যবধানে অর্থাৎ, সময়ান্তরের অপেক্ষা না ক'রেই তার হৃদয়ে দ্রুত আনন্দের উদ্ভাস হয়।[২০]

নিষ্কাম কর্মের ধারণায় সংশ্লিষ্ট অপর একটি ধারণা হল চিত্তপ্রসাদ। ধারণাটি কান্টের নীতিবাদী তত্ত্বেও উল্লিখিত হয়েছে। তবে নিষ্কাম কর্মের ধারণার সঙ্গে এই চিত্ততৃপ্তির ধারণার প্রভেদ বিস্তর। নিষ্কাম কর্মে চিত্তপ্রসাদের ধারণাটি যেমন ভবিষ্যৎ ফলকামনা ও অতীত কর্মফলকে ঈশ্বরে অর্পণ করার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, তেমনই এই ধারণাটি স্বধর্ম এবং বর্ণাশ্রম ধারণার সঙ্গেও সংশ্লিষ্ট। আচার্য মধুসূদন স্বধর্মের লক্ষণে বিবৃত করেছেন – যে বর্ণ ও যে আশ্রমের জন্য শাস্ত্রে যে কর্ম বিহিত হয়েছে তাকেই স্বধর্ম বলে।[২১] এখন বর্ণাশ্রম ধর্মের লক্ষণব্যাখ্যায় মনুসংহিতার উপর বিরচিত মেধাতিথিভাষ্যে বলা হয়েছে – চিত্ত যাতে প্রসন্ন হয় তা হল ধর্ম। যদিও শাস্ত্রনিষিদ্ধ বিষয় সাধনেও তৃপ্তি পাওয়া যায় তবু শাস্ত্রের অবিহিত কর্ম করার ফলে সেই অনিষ্ট কারীর হৃদয়ে চাঞ্চল্য দেখা যায়। তারা "ধর্ম পালন করছি" - এই ভ্রমবশতঃ অশাস্ত্রীয়

© 2025 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

Volume 27 : 2024-2025
Journal of Philosophy and the Life-world
DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2025.27.00.18

বিষয়ভোগে যে তৃপ্তি অর্জন করে তা নির্মল আনন্দ দেয় না, তুচ্ছ জাগতিক সুখ দেয় মাত্র। হৃদয় শব্দের লাক্ষণিক অর্থ হল বেদ। অধীত হবার পর বেদ হৃদিমধ্যে ভাবনাখ্য সংস্কাররূপে থাকে ব'লে বেদের অপর নাম হৃদয়। ফলে, বেদানুগত ধর্ম কামনারহিত হয়ে সম্পাদন করলেই তা স্বধর্ম হয়।[২২] বলা বাহুল্য, এই স্বধর্মই হল নিষ্কাম কর্মের অন্যতম প্রবর্তক হেতু।

নিষ্কাম কর্মের পর্যবেক্ষণে আমাদের মনে হয়েছে, কেবল স্বধর্ম পালনই নয় চিকীর্ষাও নিষ্কাম কর্মের প্রবর্তক হতে পারে। চিকীর্ষা হল এক প্রকারের সুখ নীতি (Hedonistic Principle) যা গীতায় যে উপযোগবাদী ধারণার প্রসক্তি রয়েছে তাকে ইঙ্গিত করে। অভিপ্রায় এই যে, কর্ম সম্পাদন করতে করতে সেই কর্মের ফলে যেন কখনোই অর্থাৎ, কর্ম করার পূর্বে, পরে বা সমকালে "আমি এই ফল ভোগ করব" – এই প্রকার আসক্তি না জন্মায়। কারণ, যে ব্যক্তি ফলকামনায় কোন কর্ম সম্পাদন করে সেই ব্যক্তি কর্মফলেরও উৎপাদক বা হেতু হয়। এরূপ হলে নতুন কর্মবন্ধন সৃষ্টি হয় যা জীবের পক্ষে মোক্ষকে প্রতিহত করে।[২৩] কিন্তু এই ক্ষেত্রে গীতা কখনোই এমন বলে নি যে পরিস্থিতি অর্থাৎ, স্থান-কাল-পাত্রভেদে আমার কর্তব্যধর্ম কি হবে তাকে নিশ্চয় করতে পারা যাবে না। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, মহাভারতের কৌশিক মুনি তাঁর স্বধর্মরূপে বিবেচনা করেছিলেন সর্বদা সত্যকথনকে। এই কারণে দস্যুতাড়িত আশ্রিত যখন তাঁকে বলেন, "আপনি আমার লুকোবার স্থান দস্যুদের বলবেন না" তখন কৌশিক মুনি সেই অনুরোধ উপেক্ষা করেছিলেন। কিন্তু তাঁর এই প্রকার নিষ্ঠুর স্বধর্মরক্ষা তাঁকে স্বর্গ বা মোক্ষ কিছুই দেয় নি। পরিবর্তে তাঁর এইরূপ আচরণ তাঁর নরকগতির কারণ হয়েছিল। সুতরাং, গীতা যে স্বধর্ম পালনের কথা বলছে তা কখনোই এইপ্রকার অন্ধ ও নিষ্ঠুর স্বধর্ম হতে পারে না। এই হেতু আমাদের মনে হয়েছে, ব্যক্তিগত কর্তব্যনিশ্চয়ের ক্ষেত্রে বর্ণাশ্রমধর্মের প্রবর্তনার পাশাপাশি পরিস্থিতিবিচারসাপেক্ষে পরিগৃহীত প্রত্যুৎপন্নমতিও নিয়ামক ভূমিকা গ্রহণ করে। এই ক্ষেত্রে চিকীর্ষাও সমান ভূমিকা রাখে। আমি যে কর্ম সম্পাদন করতে চলেছি তা ইষ্টসাধক কিনা অথবা সেই কর্মটি আমার প্রযত্নসাধ্য কিনা তা বিবেচনা করেই আমায় কর্মে প্রবৃত্ত হতে হবে। এর সঙ্গে এটিও বিবেচনায় রাখতে হবে, আমার পক্ষে ইষ্টসাধকরূপে বিবেচিত কর্মটি আমার বা অন্যের পক্ষে বলবত্তর অনিষ্টসাধন করবে কিনা। যদি এইরূপ না করে কেবল তখনই সেই কর্মটি আমার সাধ্য ব'লে বিবেচ্য হতে পারে। এই প্রকারের নীতিই হল চিকীর্ষা। আমাদের বিবেচনায়, নিষ্কাম কর্মে চিকীর্ষাও সংশ্লিষ্ট হয়েছে।

তুলনামূলক আলোচনায় কান্টের নীতি তত্ত্ব ও নিষ্কাম কর্ম

আমাদের পর্যবেক্ষণে নিষ্কাম কর্মের সঙ্গে কান্টের কর্তব্যতাবাদী নীতিতত্ত্বের কিছু সাদৃশ্য এবং কিছু বৈসাদৃশ্য ধরা পড়েছে। সাদৃশ্য হল এইটুকুই যে উভয় মতেই ব্যক্তিগত স্বার্থদৃষ্টি নিয়ে কোন কর্মকে সম্পাদন করতে নিষেধ করা হয়েছে। কিন্তু উভয় মতের বৈসাদৃশ্য প্রবল। প্রথমতঃ কান্ট কখনোই কর্মের প্রতি কর্তৃত্ববোধ ত্যাগ করার কথা বলেন নি।

দ্বিতীয়তঃ অবিদ্যালেশ বা কর্মক্ষয়ের কোন আধ্যাত্মিক ধারণাও কান্টের নীতিতত্ত্বে আলোচিত হয়নি। কান্টের কর্তব্যবোধে কর্ম করার বিধিটি কোন অভ্যাসও নয় যে সেই অভ্যাসের দ্বারা কেউ আত্মানুভূতি লাভ করবে।

তৃতীয়তঃ কান্টের বিধিটি বিশুদ্ধ প্রজ্ঞার দ্বারা নিরূপিত হয়। স্বতন্ত্রকৃতিতে কোন কর্ম সম্পাদন করলে সেই কৃতির প্রসাদরূপে যে তৃপ্তি অনুভূত হয় কান্ট তাকেই আত্মসম্মান বলেছেন। কান্টের মতে, ঐ প্রকার আত্মসম্মানই বিধিবুদ্ধিতে নিষ্ঠ থাকতে এক প্রকার বাধ্যতা সৃষ্টি করে। ফলতঃ বুদ্ধিসঞ্জাত ঐ আত্মসম্মান নৈতিক কর্মের প্রবর্তক হেতু হয়ে ওঠে। বস্তুতঃ ঐ আত্মসম্মানজনিত চিত্ততৃপ্তি না থাকলে কর্তব্যবোধে কর্তব্য সম্পন্ন করার প্রেরণাই মানুষ লাভ করবে না। এই কারণে কান্ট কৃত কর্মে কর্তৃত্বজ্ঞান বা

© 2025 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

Volume 27 : 2024-2025
Journal of Philosophy and the Life-world
DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2025.27.00.18

বিধিবুদ্ধিতে কৃত কর্মের দ্বারা প্রাপ্ত চিত্তপ্রসাদের আকাঙ্ক্ষা কোনটিই বিসর্জন দেবার কথা বলেন নি। তিনি শুধু বলেছেন, কোন কর্ম আমাকে কতটুকু জাগতিক সুখ দিতে পারে তার সেই উপযোগিতা বিবেচনা ক'রে আমি কোন কর্ম করতে পারি না। অপরদিকে, নিষ্কাম কর্মের দ্বারা ধর্ম পালনে যে চিত্তপ্রসাদ লাভ হয় তার নিমিত্তক বলা হয়েছে স্বধর্মপালনকে। পুনরায় উল্লেখ্য, এই স্বধর্ম পালনের নিয়ামক হয়েছে বর্ণাশ্রমব্যবস্থা। স্বধর্মপালন ও বর্ণাশ্রম – এই উভয়ের সঙ্গেই কোথাও কোন অবস্থাতে কান্টের প্রস্তাবিত চিত্তপ্রসাদের কোন সম্বন্ধ নেই।

চতুর্থতঃ কান্ট তাঁর প্রস্তাবিত বিধিজ্ঞানের নিয়ামকরূপে কোন ঈশ্বরের রূপকল্প অঙ্গীকার করেন নি। বস্তুতঃ কান্ট তাঁর নীতিবিদ্যাকে কোন ঈশ্বরীয় সমর্থনের ভিত্তিতে স্থাপন করতেও চান নি। কর্মফলত্যাগ প্রভৃতিও তাঁর অভিপ্রেত সিদ্ধান্ত নয়। এই কারণে বিধিপালনের বা বিধিজ্ঞানের নিশ্চায়ক নিয়ামকরূপে তিনি কোন তাত্ত্বিক ঈশ্বরীয় সমর্থন প্রত্যাশা করেন নি।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, বিধিজ্ঞানের ধারণায় নিয়ামক হয়েছে কেবল মনুষ্যগত বিশুদ্ধ প্রজ্ঞা। এই কারণে কর্মের কোন উপযোগিতা বিচার ক'রে কান্ট কর্মের নৈতিকতা বিচার করেন নি। কিন্তু গীতা যে নিষ্কাম কর্মের ধারণা প্রদান করেছে তাতে চিকীর্ষার মতো উপযোগবাদী সুখনীতি সংশ্লিষ্ট হতে পারে। নিষ্কাম কর্মে কর্মফলবাসনাপরিত্যাগই মুখ্য বিবেচ্য। বস্তুতঃ কর্মফলে উদাসীন তথা নিরাসক্তচিত্ত হওয়াই হল নিষ্কাম কর্মের উদ্দেশ্য।

উল্লেখপঞ্জি

[১] ভট্টাচার্য, কৃষ্ণচন্দ্র. *কান্ট দর্শনের তাৎপর্য.* সূত্রধর, ২০২৪, পৃষ্ঠা – ১৩

[২] তদেব

[৩] তদেব

[৪] তদেব

[৫] তদেব

[৬] তদেব

[৭] ---. পৃষ্ঠা – ১৪

[৮] ---. পৃষ্ঠা – ১৪ – ১৫

[৯] ---. পৃষ্ঠা – ১৫

[১০] তদেব

[১১] ---. পৃষ্ঠা – ১৬

[১২] ---. পৃষ্ঠা – ১৭

[১৩] ---. পৃষ্ঠা – ১৬ - ১৭

[১৪] আত্মনস্তু কামায় সর্বং প্রিয়ং ভবতি – *বৃহদারণ্যকোপনিষদ্* – ২/৪/৫

© 2025 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

Volume 27 : 2024-2025
Journal of Philosophy and the Life-world
DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2025.27.00.18

[১৫] ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্য কর্মকৃৎ। কার্যতে হ্যবশং কর্মঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ।। - গীতা ৩/৫

[১৬] সরস্বতী, মধুসূদন. *গূঢ়ার্থদীপিকা. শ্রীমদভগবদগীতা,* নলিনীকান্ত ব্রহ্ম (সম্পা.), নবভারত পাবলিশার্স, ১৯৮৬ পৃষ্ঠা - ২৯৫

[১৭] --- . পৃষ্ঠা - ২৯৬

[১৮] --- . পৃষ্ঠা – ৪৮৯

[১৯] শ্রেয়ো হি জ্ঞানমভ্যাসাজ জ্ঞানাদ্ধ্যানং বিশিষ্যতে। ধ্যানাৎ কর্মফলত্যাগস্ত্যাগাচ্ছান্তিরনন্তরম্। - গীতা ১২/১২

[২০] সরস্বতী, মধুসূদন. *গূঢ়ার্থদীপিকা. শ্রীমদভগবদগীতা,* নলিনীকান্ত ব্রহ্ম (সম্পা.), নবভারত পাবলিশার্স, ১৯৮৬. পৃষ্ঠা - ২৯৫ পৃষ্ঠা – ৮৭৩

[২১] যং বর্ণাশ্রমং বা প্রতি যো বিহিতঃ স তস্য স্বধর্ম।

--- . পৃষ্ঠা – ৩৪০

[২২] মেধাতিথি, *মেধাতিথিভাষ্য. মনুস্মৃতি.* প্রথম খণ্ড, ভূতনাথ সপ্ততীর্থ (অনু.), তথাগত, ২০২২. পৃষ্ঠা – ৬৬

[২৩] সরস্বতী, মধুসূদন. *গূঢ়ার্থদীপিকা. শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা,* নলিনীকান্ত ব্রহ্ম (সম্পা.), নবভারত পাবলিশার্স, ১৯৮৬. পৃষ্ঠা – ২৪৪ – ২৪৫

© 2025 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore